বিজয়ের মাসে তিন কিংবদন্তির বিদায়

২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে না ফেরার দেশে চলে গেছেন তিন কিংবদন্তি। চলে গেলেন 'এই পদ্মা এই মেঘনা' গানের আবু জাফর। সঙ্গীতশিল্পী পাপিয়া সারোয়ার ও কবি হেলাল হাফিজ। তাদের প্রতি রঙবেরঙের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শ্রদ্ধা।

মৌ সন্ধ্যা

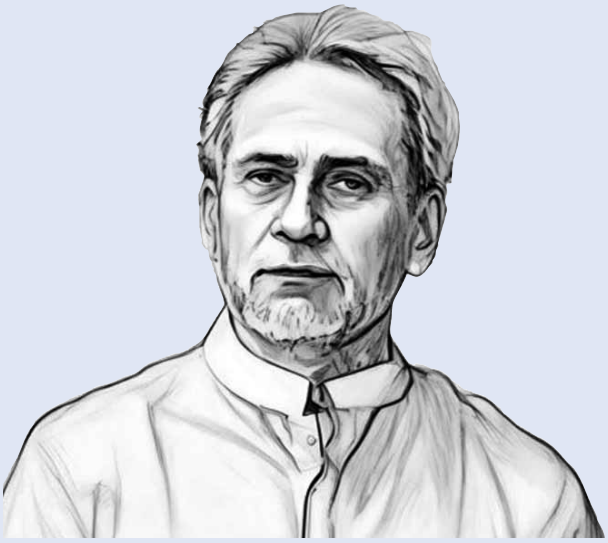

মে ১৫, ১৯৪৩ - ডিসেম্বর ৫, ২০২৪

না ফেরার দেশে আবু জাফর

'এই পদ্মা এই মেঘনা', 'তোমরা ভুলেই গেছ মল্লিকাদির নাম', 'নিন্দার কাঁটা যদি না বিঁধিল গায়ে'সহ অনেক কালজয়ী গানের গীতিকার, সুরকার আবু জাফর সবাইকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন ২০২৪ সালের ৫ ডিসেম্বর। ওইদিন রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তার মেয়ে জিয়ান ফারিয়া জানান, বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন এই সুরকার। তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

কুষ্টিয়ায় চির নিদ্রায় আবু জাফর

কিংবদন্তি গীতিকার ও সুরকার আবু জাফর এক মেয়ে ও তিন ছেলে রেখে গেছেন। বরেণ্য সঙ্গীতশিল্পী ফরিদা পারভীন তার সাবেক স্ত্রী। মৃত্যুর পর সুরকারের মরদেহ নেওয়া হয় জন্মস্থান কুষ্টিয়ায়। ৬ ডিসেম্বর কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ মাঠে তার জানাজা হয়। গুণী এ মানুষটির প্রয়াণে শোকস্তব্ধ হয়ে যায় পুরো সঙ্গীতভুবন। তিনি শুধু সঙ্গীতাঙ্গনের মানুষই ছিলেন না, ছিলেন একজন কবি ও সবার প্রিয় শিক্ষক। চুয়াডাঙ্গা কলেজ ও কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তার জন্ম কুষ্টিয়ার কুমারখালীর চাঁদপুর ইউনিয়নের গড়ের বাড়ি কাঞ্চনপুর গ্রামে।

আবু জাফরের কর্মমুখর জীবন

রাজশাহী-ঢাকা বেতার এবং টেলিভিশনের নিয়মিত সঙ্গীতশিল্পী ও গীতিকার ছিলেন আবু জাফর। তার রচিত দেশাত্মবোধক ও আধুনিক গানগুলো বেশ জনপ্রিয়তা পায়। 'এই পদ্মা এই মেঘনা' আবু জাফরের সৃষ্টি করা এক অনন্য গান। গানটি বিবিসির জরিপে সর্বকালের সেরা ২০টি গানের মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল। পাশাপাশি 'তোমরা ভুলেই গেছ মল্লিকাদির নাম', 'নিন্দার কাঁটা যদি না বিঁধিল গায়ে', 'আমি হেলেন কিংবা নুরজাহানকে দেখিনি', 'তুমি রাত আমি রাতজাগা পাখি' গানগুলোও ছিল তার অনন্য সৃষ্টি। নিজের রচিত সব গানের বাণীতে সুর সংযোজনও করেছেন ও অনেকগুলো গানে নিজেই কণ্ঠ দিয়েছেন আবু জাফর।

গানের ভুবনে থাকা মানুষটি লিখেছেন বেশ কিছু বই। এর মধ্যে 'নতুন রাত্রি পুরনো দিন' (কাব্য), 'বাজারে দুর্নাম তবু তুমিই সর্বস্ব' (কাব্য), 'বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত কবিতা' (অনুবাদ কাব্য) উল্লেখযোগ্য। শেষ দিনগুলোতে তার পাশে ছিলেন এক মেয়ে ও তিন ছেলে।

চলে গেলেন পাপিয়া সারোয়ার

বিজয়ের মাস ডিসেম্বরেই চলে গেলেন আরেক কিংবদন্তি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী পাপিয়া সারোয়ার। একুশে পদকপ্রাপ্ত এই শিল্পী ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৩ ডিসেম্বর জানাজা শেষে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয় তাকে।

ক্যানসারে ভুগছিলেন পাপিয়া

দীর্ঘ দিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন পাপিয়া সারোয়ার। তার স্বামী সারওয়ার আলম জানান, ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসেও ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন পাপিয়া। সর্বশেষ তেজগাঁওয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। সেখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। মৃত্যুর সময় তিনি স্বামী ও দুই সন্তান রেখে গেছেন। বড় মেয়ে জারা সারোয়ার কলেজ অব নিউ জার্সিতে জীববিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক এবং ছোট মেয়ে জিশা সারোয়ার কানাডার অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন নির্বাহী।

নভেম্বর ২১, ১৯৫২ - ডিসেম্বর ১২, ২০২৪

পাপিয়া সারোয়ারের বর্ণিল জীবন

১৯৫২ সালের ২১ নভেম্বর বরিশালে পাপিয়া সারোয়ারের জন্ম হয়। ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্র অনুরাগী পাপিয়া ষষ্ঠ শ্রেণিতে ছায়ানটে ভর্তি হন। পরে তিনি বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে ভর্তি হন। ১৯৬৭ সাল থেকে বেতার ও টিভিতে তালিকাভুক্ত শিল্পী হিসেবে গান করেন তিনি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। ১৯৭৩ সালে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতে ডিগ্রি নিতে ভারতে যান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনিই প্রথম ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে সেখানে স্নাতক করার সুযোগ পান। এর আগে তিনি ছায়ানটে ওয়াহিদুল হক, সন্‌জীদা খাতুন ও জাহেদুর রহিমের কাছে গানের দীক্ষা নেন। তার প্রথম অডিও অ্যালবামটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮২ সালে। অ্যালবামটির নামও ছিল 'পাপিয়া সারোয়ার'। আধুনিক গানেও জনপ্রিয় ছিলেন তিনি। তার গাওয়া জনপ্রিয় গানটি হলো 'নাই টেলিফোন নাই রে পিয়ন নাইরে টেলিগ্রাম'। সর্বশেষ অ্যালবাম 'আকাশপানে হাত বাড়ালাম' প্রকাশ করেছিলেন ২০১৩ সালে। পাপিয়া সারোয়ার ২০১৩ সালে বাংলা একাডেমি থেকে রবীন্দ্র পুরস্কার পান। ২০১৫ সালে বাংলা একাডেমি ফেলোশিপ লাভ করেন। ২০২১ সালে পেয়েছেন একুশে পদক। ১৯৯৬ সালে 'গীতসুধা' নামে একটি গানের দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বরেণ্য এই সঙ্গীতশিল্পী।

হারালেন প্রেম ও দ্রোহের কবি হেলাল হাফিজ

'এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়/ এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়' - এ কালজয়ী পঙ্‌ক্তি লিখেছিলেন যিনি, সেই কবি হেলাল হাফিজও না ফেরার দেশে পাড়ি জমান বিজয়ের মাসে। ২০২৪ সালের ১৩ ডিসেম্বর দুপুরে শাহবাগের সুপার হোম হোস্টেলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। পরে তার মরদেহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) রাখা হয়। পরের দিন ১৪ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবি হেলাল হাফিজের দাফন সম্পন্ন হয়। ওইদিন মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এর আগে বাংলা একাডেমিতে কবির প্রথম জানাজা ও জাতীয় প্রেসক্লাবে দ্বিতীয় জানাজা হয়। সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কবির আত্মীয়-স্বজন ও ভক্ত-অনুরাগীসহ বিশিষ্টজনেরা। উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী এবং বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম।

হেলাল হাফিজের কাব্যময় জীবন

১৯৪৮ সালের ৭ অক্টোবর নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার বড়তলী গ্রামে হেলাল হাফিজের জন্ম। শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য কেটেছে নিজের শহরেই। ১৯৬৭ সালে নেত্রকোনা কলেজ থেকে

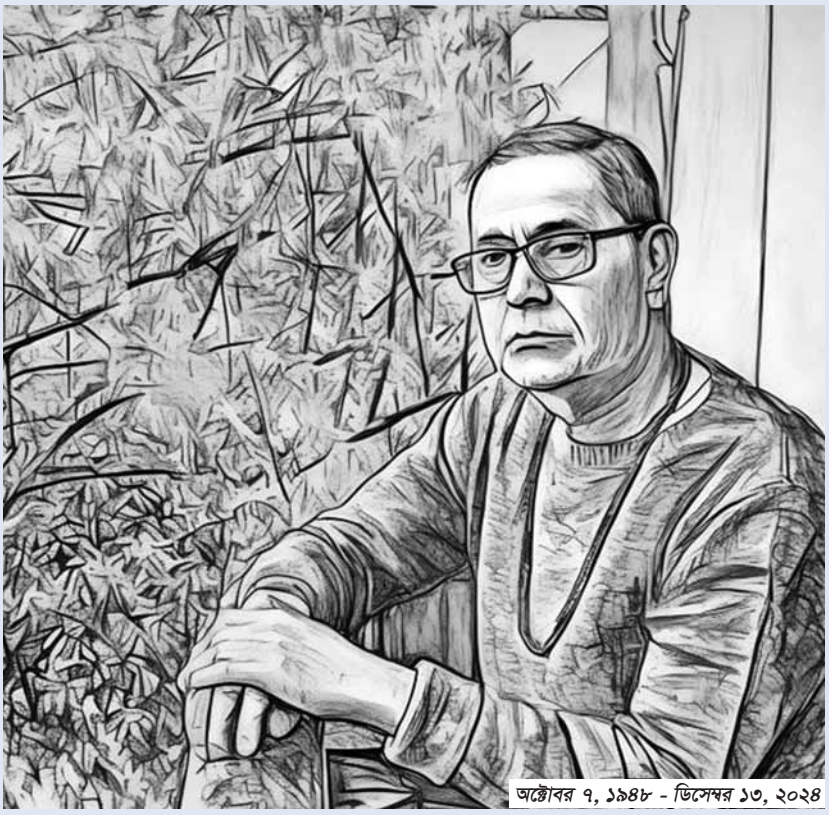

অক্টোবর ৭, ১৯৪৮ - ডিসেম্বর ১৩, ২০২৪

উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। উত্তাল ষাটের দশক হয়ে ওঠে তার কবিতার উপকরণ। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় রচিত 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়' কবিতাটি তাকে খ্যাতি এনে দেয়। তার কবিতা হয়ে উঠেছিল মিছিলের স্লোগান। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত প্রথম কবিতা গ্রন্থ 'যে জ্বলে আগুন জ্বলে' কবিকে নিয়ে যায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে। এরপর বইটির ৩৩টির বেশি সংস্করণ বেরিয়েছে। তিনি দীর্ঘসময় নিজেকে অনেকটা আড়ালে সরিয়ে নিয়েছিলেন। আড়াই দশক পর ২০১২ সালে তিনি পাঠকদের জন্য আনেন দ্বিতীয় বই 'কবিতা ৭১'। তার তৃতীয় এবং সর্বশেষ বই 'বেদনাকে বলেছি কেঁদো না' প্রকাশিত হয় ২০১৯ সালে।

অলৌকিক ভাবে বেঁচে যাওয়া হেলাল হাফিজ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের রাতে অলৌকিকভাবে বেঁচে যান হেলাল হাফিজ। ওই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়েছিলেন। এরপর কারফিউ শুরু হলে তৎকালীন ইকবাল হলে (বর্তমানে জহুরুল হক) থাকার পরিবর্তে ফজলুল হক হলেই থেকে যেতে হয় তাকে। পরে ২৭ মার্চ কারফিউ তুলে নেওয়ার পর কবি হেলাল হাফিজ নিজের হলে গিয়ে দেখেন, চারদিকে ধ্বংসস্তূপ, লাশ আর লাশ। হলের গেট দিয়ে বেরুতেই কবি নির্মলেন্দু গুণের সঙ্গে দেখা হয় তার। তাকে জীবিত দেখে বুকে জড়িয়ে ধরেন নির্মলেন্দু গুণ। ২৫ মার্চের কালরাতে হেলাল হাফিজের কী পরিণতি ঘটেছে তা জানার জন্য আজিমপুর থেকে ছুটে এসেছিলেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। পরে কেরানীগঞ্জের দিকে আশ্রয়ের জন্য দুজন একসঙ্গে বুড়িগঙ্গা নদী পাড়ি দেন।

হেলাল হাফিজের সাংবাদিক জীবন

দেশ স্বাধীনের পর সাংবাদিকতায় যোগ দেন কবি হেলাল হাফিজ। তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে আড়াল করে ফেলেন সবার কাছ থেকে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সময় ১৯৭২ সালে দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৬ সালের শেষ দিকে দৈনিক দেশ পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক পদে যোগ দেন। সর্বশেষ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন এই কবি।

শেষ কথা

সব মিলিয়ে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসটি শিল্প-সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষদের জন্য শোকের মাসে পরিণত হয়েছে। প্রিয় মানুষদের হারিয়ে শোকাহত হয়েছে তাদের ভক্তরা। প্রতিবছর এই মাস ফিরে আসবে। কিন্তু আর কখনও ফিরে আসবেন না আবু জাফর, পাপিয়া সারোয়ার ও হেলাল হাফিজেরা। তারা শুধুই থেকে যাবেন তাদের শিল্পকর্মের মধ্যে। গুণী মানুষেরা ভালো থাকুন ওপারেও। ভালোবাসার মানুষদের কাছে চিরকাল শ্রদ্ধায় থাকবেন তারা। নতুন প্রজন্মের তরুণেরাও যুগ যুগ ধরে আলোর দিশা পাবে তাদের শিল্পকর্ম থেকে। গুণী মানুষেরা এভাবেই বেঁচে থাকে। তাদের মৃত্যু নেই।